চিন্তার পরিশুদ্ধি

মুহাম্মাদ কুতুব

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

ইসলামের সোনালি ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখি, মুসলিমরাই ছিল পৃথিবীর বিজয়ী জাতি; তাদের হাতেই ছিল জমিনের শাসনক্ষমতা। তাদের কল্যাণে পৃথিবীবাসী দেখেছিল ইনসাফপূর্ণ শান্তিময় আবাস। ফলে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পথহারারা দলে দলে শামিল হচ্ছিল আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের ছায়াতলে। কুফর-শিরকের অমানিশা কেটে অবাধ্য জাতিগুলো আসছিল হিদায়াতের পথে। কেউ গোমরাহির মাঝে বিভোর থাকলেও তারা মুসলিমদের কর্তৃত্ব মেনেই দুর্বল হয়ে জমিনে বসবাস করত। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চোখ রাঙানোর দুঃসাহস তাদের হতো না। যারাই এমন দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তাদের কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আজ মুসলিমদের কী হলো?! উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের সেই সোনালি ইতিহাসের সাথে আজকের মুসলিমদের অবস্থার কেন এত ব্যবধান?! দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের মুসলিমরা দুর্বল-নতজানু হয়ে জমিনে বসবাস করছে! পার্থিব প্রয়োজন পূরণ আর অনুকম্পা পাওয়ার আশায় কাফিরদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিচ্ছে!

মুসলিমদের আজকের এই অবমাননাকর পরিস্থিতি কি এমনি এমনিই হয়েছে? না; এমনি এমনিই হয়নি; বরং তারা ভুলে গেছে তাদের আসল স্বরূপ ও স্বকীয়তা। তাদের মাঝে আজ সেই বৈশিষ্ট্যের ঝলক নেই, যা ছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মানুষগুলোর মাঝে। আজকের মুসলিমরা ভুলে বসেছে মুক্তির মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মকথা। তাদের অনেকেই আজ জানে না, এ মহান কালিমার কী দাবি। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম, ইবাদতের মর্ম, কাজা ও কদরের মর্ম, দুনিয়া ও আখিরাতের মর্ম, সভ্যতা ও পৃথিবী আবাদের মর্ম, এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমানের মুসলিমরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মানুষগুলোর মতপথ ও চিন্তাচেতনা থেকে দূরে সরে পড়েছে! বস্তুত এসব বিষয়ে আজকের মুসলিমদের বিচ্যুতির ফলেই তাদের এমন অধঃপতন।

তবে এ অবস্থার মাঝেই নিরাশ হয়ে থাকলে কি কভু অবস্থার পরিবর্তন হবে? লাঞ্ছনা আর গ্লানি দূর হবে? না; মুসলিমদের বরং আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে, ঘুরে দাঁড়াতে হবে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের সেই আলোকিত মানুষগুলোর মতো করে, তাঁদের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে তার দাবি আদায়ে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। ইবাদতের মর্ম, কাজা ও কদরের

মর্ম, দুনিয়া ও আখিরাতের মর্ম, সভ্যতা ও পৃথিবী আবাদের মর্ম এগুলো বুঝতে হবে সঠিক ও যথাযথভাবে।

প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়গুলোরই সঠিক মর্মকথা উঠে এসেছে অতি চমৎকারভাবে। মূলত 'চিন্তার পরিশুদ্ধি' গ্রন্থটি বিজ্ঞ লেখক শাইখ মুহাম্মাদ কুতুবের বিখ্যাত গ্রন্থ (مفاهيم ينبغي أن تصحح)-এর পরিমার্জিত সংক্ষিপ্ত রূপ। ইনশাআল্লাহ, অনন্যসাধারণ এ গ্রন্থটি বর্তমান মুসলিম পাঠকদের মাঝে খুলে দেবে সঠিক চিন্তাভাবনার দুয়ার। তারা বুঝতে পারবে, শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে তাদের বর্তমান অবস্থার এত বিশাল ব্যবধানের মূল কারণ। আর নিজেদের শুধরে নিয়ে গ্রহণ করতে পারবে সঠিক প্রয়াস। আল্লাহ তাআলা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে আমাদের জন্য ভরপুর উপকারী হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের চিন্তাচেতনার মাঝে পরিশুদ্ধি দান করুন, আমিন।

- ইফতেখার সিফাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'সৎকর্ম শুধু এটাই নয় যে, তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাবে। বরং সৎকর্ম হচ্ছে, যে ইমান আনে আল্লাহর প্রতি, পরকাল দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নবিদের প্রতি; যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অসহায়, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তিতে সম্পদ দান করে; সালাত কায়িম করে; জাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ করে; অভাব-অনটনে, দুঃখ-কষ্টে ও প্রচণ্ড যুদ্ধমুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকি।'[১]

১. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭।

সূচিপত্র

ভূমিকা ¦

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম ¦

ইবাদতের মর্মকথা ¦

কাজা ও কদরের মর্ম ¦

দুনিয়া ও আখিরাতের মর্ম ¦

সভ্যতা ও পৃথিবী আবাদের মর্ম ¦

আগামীর পথে ¦

ভূমিকা

আজ ইসলামি বিশ্ব ইতিহাসের যে পর্বটি অতিক্রম করছে, তা সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। বিষয়টি আমি অন্য বইয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি।[২] যদি মুসলিম উম্মাহর পুরো ইতিহাসে এটি সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা নাও হয়, তবে ইতিপূর্বে মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত দুর্যোগগুলো এভাবে একই সময়ে পুরো উম্মাহর ওপর আপতিত হয়নি—যেভাবে বর্তমান অবস্থায় হচ্ছে। লাঞ্ছনা, অপমান আর দুর্দশা পুরো উম্মাহব্যাপী ছিল না—যেভাবে আজ পুরো উম্মাহকে বিষয়গুলো গ্রাস করে নিয়েছে।

যদি গত শতাব্দীতে স্পেনপতনকে মুসলিমদের ওপর বয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি এর চেয়েও বড়। কারণ, যে সময়ে স্পেন থেকে মুসলিমদের ছায়া সংকুচিত হয়ে আসছিল, সে সময়ে তারুণ্যদীপ্ত উসমানি খিলাফত কনস্টান্টিনোপলে হামলা করে তা ইসলামি খিলাফতের রাজধানীতে রূপান্তর করছিল। অতঃপর সেনাবাহিনী নিয়ে উসমানিরা ইউরোপে প্রবেশ করছিল। একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী ভিয়েনা ও সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি যখন সংঘটিত হয়ে চলেছে, মুসলিমদের কর্তৃত্ব তখন প্রতিটি ভূখণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। কোনো অঞ্চলই মুসলিমদের গণহত্যা থেকে মুক্ত থাকছে না। ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া, ইউরোপ, চাদ, নাইজেরিয়া, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমস্ত অঞ্চলে মুসলিমদের হয়তো কুফর নয়তো মৃত্যু—যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপশক্তির বলয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে। ইসলামি ভূখণ্ডে অনৈসলামি রাষ্ট্র গঠনের জন্য একের পর এক পরিকল্পনা হচ্ছে। প্রতিবারই ইসলামি ভূখণ্ড থেকে একটি করে অংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে অবশিষ্ট মুসলিমদের হয়তো গোলাম বানানো হচ্ছে, নয়তো হত্যা করা হচ্ছে। হত্যা করা হচ্ছে ইসলামের দায়িদের। তাদের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হচ্ছে ইসলামের ধ্বজাধারী শাসকদের হাতে—যারা মুসলিমদের জন্য আল্লাহর শরিয়াহ দিয়ে শাসন করা প্রত্যাখ্যান করেছে।

---

২. অর্থাৎ 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইয়ে। এ বইয়ের আগে 'মাফাহিম' বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল, যেহেতু মাফাহিম বইটি এ বইয়ের কয়েক বছর পূর্বে লিখিত হয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তার কয়েক বছর পরে 'মাফাহিম' প্রকাশ হবে। 'মাফাহিম' বইয়ের কয়েক বছর পরে যে বইটি লিখেছি সেটা তার পূর্বে প্রকাশ পাবে। সবকিছুরই আল্লাহর কাছে একটা নির্ধারিত সময় আছে।

ইতিহাসের নজিরবিহীন এমনই মর্মান্তিক কালো অধ্যায় আজ মুসলিম বিশ্ব পার করছে।

এই পরিস্থিতিতে কোনো কিছুই লক্ষ্যহীনভাবে ঘটছে না। বস্তুত মানব ইতিহাসে লক্ষ্যহীনভাবে কোনো কিছু ঘটা সম্ভবও নয়। মানব ইতিহাসে সবকিছুই আল্লাহর সুন্নাহ মোতাবিক সংঘটিত হয়। কোনো সৃষ্টির ব্যাপারেই আল্লাহর সুন্নাহ ভিন্নতর হয় না, কারও পক্ষপাতও করে না।

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا

'অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে কখনোই পরিবর্তন পাবেন না। আর আল্লাহর নীতিতে আপনি কিছুতেই কোনো ব্যতিক্রমও পাবেন না।'[৩]

আল্লাহর একটি নীতি হচ্ছে, তিনি কোনো জাতির প্রতি কোনো নিয়ামত দান করলে তা ওই সময় পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই সে নিয়ামতকে পরিবর্তন করে—যতক্ষণ না তারা নিজেরাই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'সেটার কারণ এই যে, আল্লাহ সেসব নিয়ামত কখনোই পরিবর্তন করেন না, যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই সে নিয়ামত পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'[৪]

আল্লাহর আরেকটি নীতি হচ্ছে, কেউ সৎ ও পুণ্যবান জাতির সন্তান হওয়ার কারণেই আল্লাহ তার পক্ষপাত করেন না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

'স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন ইবরাহিমকে তার রব কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দেখালেন। তখন পালনকর্তা বললেন, "আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব।" তিনি বললেন,

৩. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৪৩।
৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৩।

"আমার বংশধর থেকেও।" পালনকর্তা বললেন, "আমার অঙ্গীকার জালিমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।"[৫]

আল্লাহ কোনো জাতিকে কেবল তখনই ক্ষমতা দান করেন, যখন তারা নিজেরাই সৎ মুমিন হয়ে যায়।

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা দান করবেন—যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন। তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।'[৬]

যারা আল্লাহর কিতাবকে গতানুগতিক উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে—তথা আল্লাহর কিতাবকে তারা নিজেদের জন্য বিশেষ কিছু বা আবশ্যকীয় মনে করে না—বরং শুধু বাপদাদা থেকে প্রাপ্ত মিরাসি সম্পদ গণ্য করে, তারাই হচ্ছে অযোগ্য এবং কলঙ্কিত উত্তরসূরি। এদের মন্দ পরিণতি থেকে মুসলিমদের সর্তক করার জন্য বনি ইসরাইলের আলোচনাপর্বে কুরআনে এদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَّا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'অতঃপর তাদের পরে কিছু অপদার্থ আসে। যারা কিতাবের উত্তরসূরি হয়ে পার্থিব তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করত আর বলত, "আমাদের ক্ষমা করা হবে।" বস্তুত

৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১২৪।
৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৫৫।

তাদের সামনে আবারও এ ধরনের তুচ্ছ বস্তু আসলে তারা তা গ্রহণ করে নেবে। তবে কি তাদের কাছে কিতাবের মধ্যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সত্যই বলবে। অথচ তারা কিতাবে যা আছে, তা অধ্যয়ন করেছে। বস্তুত পরকালের আবাস মুত্তাকিদের জন্য উত্তম পুরস্কার। তোমরা কি বোঝো না?![৭]

এরাই সেই জাতি, যাদের ব্যাপারে মহান রব বলছেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

'অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থরা আসলো, যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ভ্রষ্টতার মুখোমুখি হবে।'[৮]

এ সবই হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত নীতি। যার মাধ্যমে মানবজীবনের সকল বিষয় পরিচালিত হয়। যা কারও পক্ষপাতিত্ব করে না। কোনো মানুষের সামান্য প্রবৃত্তির সামনে যা কিঞ্চিতও পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর ওপর কর্তৃত্ব, খিলাফত ও নিরাপত্তার অনুগ্রহ দান করেছিলেন। আসমান-জমিনের সকল কল্যাণের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যেভাবে মুত্তাকিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'যদি জনপদবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই তাদের প্রতি আসমান-জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম।'[৯]

অতঃপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন হলো। খিলাফত, কর্তৃত্ব আর নিরাপত্তার অবস্থান থেকে দুর্বলতা, লাঞ্ছনা আর নিরাপত্তাহীনতার স্তরে নেমে গেল। তারা গৃহহীন, লাঞ্ছনা আর হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হলো—যখন তারা সেই চরিত্রে রূপ নিল, যে চরিত্রের ব্যাপারে রাসুল ﷺ তাদের সতর্ক করেছেন :

৭. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬৯।
৮. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯।
৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৬।

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ»...

"অচিরেই অন্যান্য জাতিবর্গ তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকতে থাকবে—যেভাবে খাবার গ্রহণকারীরা খাবারপাত্রে একে অপরকে ডাকতে থাকে।" তখন সাহাবিদের কেউ জিজ্ঞেস করলেন, "সেদিন কি আমরা কম হওয়ার কারণে এমনটি হবে হে আল্লাহর রাসুল!" রাসুল ﷺ বললেন, "বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো।..."[১০]

তাহলে কোন বস্তুর পরিবর্তন হলো? কীভাবেই বা ঘটল এই পরিবর্তন?

ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় মুসলিমদের জীবনে অনেক বিকৃতি-বিচ্যুতিই ঘটেছে। আল্লাহর দেওয়া মানহাজ থেকে তাদের জীবনে প্রতিটি বিচ্যুতিরই একটি শাস্তি রয়েছে। বিচ্যুতির ধরন অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই তাদের ওপর এই শাস্তি আপতিত হয়েছে—তৎক্ষণাৎ বা দেরিতে, বিচ্যুতির ব্যাপারে উম্মাহর শাসক, উলামা ও জনসাধারণের অবস্থান অনুপাতে। একপর্যায়ে বিচ্যুতি যখন তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছল, তখন তাদের সেই পরিণতি হলো, যা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। খিলাফত, কর্তৃত্ব ও নিরাপত্তার পরে তাদের জুটল দুর্বলতা, লাঞ্ছনা ও ভয়ভীতি।

এ বইয়ে আমরা সমস্ত বিচ্যুতির দীর্ঘ পথপরিক্রমা সম্পর্কে আলোচনা করব না।[১১]

এখানে আমরা বিকৃতির একটি নির্দিষ্ট প্রকার নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রকারের বিকৃতিটিই বর্তমান সময়ে মুসলিম জীবনে বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথবা ঐতিহাসিকভাবে এই প্রকারটিই বিকৃতির সারনির্যাস।

অনেক মুখলিস দায়িরাও বিশ্বাস করেন, মুসলিমদের ওপর যে দুর্যোগ আপতিত হয়েছে, তা কেবল বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে তাদের পদ্ধতিগত বিচ্যুতির কারণেই হয়েছে।

---

১০. সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৭, মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৭।

১১. এ সম্পর্কে 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইয়ে আলোচনা করেছি।

মুসলিমদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, তাদের জীবনের অঙ্গনে যে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, নিফাকি, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, হীনতা, বিদআত ও নাফরমানি ছড়িয়ে পড়েছে, যুবকদের মাঝে গা বাঁচানো ও পলায়নের যে মানসিকতা ঢুকে পড়েছে, মানুষের মাঝে পাপাচার ও অন্যায়ের প্রতি ঝোঁক এবং অন্যান্য আরও যে শত মন্দ কাজ ও স্বভাবগুলো জেঁকে বসেছে—এসবের কোনোটারই ইসলামে বৈধতা নেই; অথচ মুসলিমরা আজ এসবের মাঝেই বাস করছে।

উপরন্তু এদের জীবনে বিচ্যুতি শুধু কর্মগত বিচ্যুতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের জীবনে এটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর বিচ্যুতি নয়। যদি বিষয়টি এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত, তবে খারাপ হলেও তা অনেক সহজ ছিল! কিন্তু বিষয়টি সীমা অতিক্রম করে 'বুঝ ও বিশ্বাসের' মাঝে বিচ্যুতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর ইসলামের মৌলিক সকল বিশ্বাস শুরু হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে।

কোনো মানুষের যখন কর্মগত বিচ্যুতি থাকে—কিন্তু তার দ্বীনের ব্যাপারে বুঝ-বিশ্বাস সঠিক ও বিশুদ্ধ থাকে, তখন তার পেছনে সামান্য চেষ্টা করলেই তাকে কর্মগত বিচ্যুতি থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। যার দ্বীনি বুঝ সঠিক, তার সে বুঝ ঠিক করতে আপনার কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন পড়বে না। কেননা, তার বুঝ এমনিতেই সঠিক আছে; যদিও তার কাজগুলো এর থেকে বিচ্যুত। আর যখন কারও স্বয়ং দ্বীনি বুঝের মধ্যেই বিচ্যুতি থাকে, তখন প্রথমে তার দ্বীনি বুঝ ঠিক করতে অনেক পরিশ্রমের দরকার হবে। তারপর তার কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে আরও সময় যাবে।

বর্তমান ইসলামি বিশ্বের এটাই বাস্তবতা।

কর্মগত ভুল অতিক্রম করে দ্বীনের মৌলিক বুঝের মাঝে ভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে। এ কারণে ইসলাম আজ সেই অপরিচিতিই ধারণ করেছে, যার কথা রাসুল ﷺ বলেছেন :

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا،

> 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে, যেভাবে তা শুরু হয়েছে।'[১২]

ইসলাম বাস্তবেই আজ অপরিচিত হয়ে গেছে। স্বয়ং মুসলিমদের কাছেই আজ ইসলাম অপরিচিত হয়ে গেছে। তারা ইসলামকে তার সঠিক অবস্থা থেকে ভিন্নভাবে কল্পনা

১২. সহিহ মুসলিম : ১৪৫।

করে। সেই সাথে তো পদ্ধতিগত বিচ্যুতি আছেই। যখন তাদের সামনে ইসলামকে বাস্তব চিত্রে পেশ করা হয়—যেভাবে কুরআন-সুন্নাহয় এসেছে এবং সালাফে সালিহিনদের জীবনে যার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ হয়েছে—তখন তাদের কাছে ইসলাম অপরিচিত মনে হয়।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিষয়টির বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া।

কারণ, দ্বীনি বুঝের বিচ্যুতি রেখে আমরা মানুষের আমল ঠিক করার ব্যাপারে যত চেষ্টাই ব্যয় করি না কেন, তা কখনোই পরিপূর্ণ ফল বয়ে আনবে না এবং বর্তমানে উম্মাহ যে গর্তে পতিত হয়ে আছে, তা থেকে কখনোই বের হতে পারবে না। তাই শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মুসলিমগণ ইসলামের প্রথম পর্যায়ের অপরিচিতি দূর করতে যে কষ্ট-মুজাহাদা করেছেন, ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরিচিতি অবস্থা দূর করার জন্যও আমাদের আরও বেশি কষ্ট-মুজাহাদা করতে হবে।

এই দ্বিগুণ শ্রম-সাধনাই আজ সচেতন ইসলামি সমাজের অবধারিত মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের সঠিক বুঝ গ্রহণের মানহাজ বা পদ্ধতি ঠিক করার চেষ্টা করব।

এই দ্বীনের বুঝ আমরা কোথা থেকে পাব? কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল ﷺ এবং সালাফে সালিহিনদের জীবনী থেকে? নাকি এই সুস্পষ্ট ও সরল বুঝের ওপর যে বিকৃত ও নবাগত চিন্তার আস্তর পড়েছে, যে চিন্তা মুসলিম উম্মাহর জীবনের বিগত কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমায় বিভিন্ন কর্মের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা এবং মত-পথের সাথে সর্বদা সহাবস্থানের কারণে তৈরি হয়েছে, তা থেকে?!

যখন আমরা সঠিক বুঝ প্রাপ্তির মানহাজ ও উৎস সংশোধন করব এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে উত্তরসূরি মুসলিমদের অনুভূতিতে ইসলামের মৌলিক বুঝের ব্যাপারে যে বিকৃতি প্রবেশ করেছে, তা সংশোধন করব, তখন আমাদের সামনে অপর একটি মিশন বাকি থাকবে, যা পূর্বের মিশন থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা হলো, এ দ্বীনের সঠিক বুঝের ওপর উম্মাহকে তারবিয়াত দেওয়ার মিশন।

তারবিয়াত হলো সেই প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত চেষ্টা, যা থেকে প্রত্যাশিত ফল আশা করা যায়। কিন্তু এ ফল কেবল তখনই আসবে, যখন তা সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই বইটি ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয়সংশ্লিষ্ট বুঝ সঠিক করার সামান্য প্রচেষ্টা। যা গ্রহণ করা হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহিনের পবিত্র জীবনী থেকে। সেই সাথে এগুলোর ওপর মুসলিম উম্মাহর বিগত কয়েক শত বছরের ইতিহাসে যে বিকৃতি যুক্ত হয়েছে, তাও দূর করা হয়েছে।

এ বইয়ে আমরা ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের মর্ম সন্নিবেশিত করেছি।

এক. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম।

দুই. ইবাদতের মর্ম।

তিন. কাজা ও কদরের মর্ম।

চার. দুনিয়া ও আখিরাতের মর্ম।

পাঁচ. সভ্যতা ও পৃথিবী আবাদের মর্ম।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা পাবেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মসম্পর্কিত। তারপর পাবেন ইবাদতের বুঝসংক্রান্ত আলোচনা। কারণ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ভিত্তি। আবার এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বুঝের মধ্যে বিকৃতিই মুসলিমদের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ানক। একইভাবে ইবাদতের বুঝের ক্ষেত্রেও একই কথা। এই উম্মাহর সোনালি যুগ ও তখনকার অবদানগুলোর ক্ষেত্রে যেমন এর ছিল বিস্তৃত ও সর্বব্যাপী অর্থ, ঠিক তেমনই বর্তমান মুসলিমদের অধঃপতিত বাস্তবতায় এর অর্থ হয়ে গেছে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

তাই যখন এই মর্মগুলো সঠিক করা হবে এবং তার প্রকৃত কার্যকর ও জীবন্ত চিত্র মুসলিমদের হৃদয়ে ফিরে আসবে, তখন আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমদের গ্রাস করা প্রতিটি বিচ্যুতি ও খারাপ প্রভাব সংশোধন করা সহজ হয়ে যাবে।

এই নগণ্য প্রচেষ্টায় আল্লাহ যদি আমাকে কিছু তাওফিক দান করেন, তবে অবশ্যই আমি তাঁর নিয়ামতের শোকরগোজার করব। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

-মুহাম্মাদ কুতুব

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম

সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ—এমনকি এ দ্বীনের সকল কিছুর পূর্বে ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

যিনি তাদাব্বুর ও গভীর চিন্তার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই লক্ষ করবেন, কিতাবুল্লাহ সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়, তা হচ্ছে তাওহিদের বিষয়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিষয়। কারণ, পুরো কুরআনের সিংহভাগ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আলোচনা। আর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাসমূহে।

অবশ্য প্রথমবারেই যে বিষয়টি মাথায় আসবে—যা আমি 'দিরাসাতুন কুরআনিয়্যাহ' বইয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি, কিতাবুল্লাহয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে, এই কুরআনে সর্বপ্রথম মুশরিক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। সে বিবেচনায় ইলাহ বা উপাস্যের ব্যাপারে তাদের মন্দ ধারণা ও ভ্রান্ত আকিদা শুদ্ধ করার জন্য তাওহিদের আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহেও এ বিষয়ে আলোচনা জারি রাখা হয়েছে; যদিও তখন বিশুদ্ধ আকিদা স্থির ছিল। ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের সকল দাবি ও দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছিল। যার শীর্ষে আছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এটি নিশ্চিতভাবেই তাওহিদের আলোচনার গুরুত্বের স্পষ্ট প্রমাণ। এ জন্যই মাদানি সুরাতেও মুমিনদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...) 'হে ইমানদারগণ,...'।

কারণ, তাওহিদের বিষয়—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিষয় এমন নয় যে, কিছু সময় আলোচনা করে তারপর অন্য আলোচনায় যাওয়া যাবে। বরং এ আলোচনা করতে

করতে এবং এটাকে সাথে নিয়েই অন্য আলোচনায় যেতে হয়। এর আলোচনা কোনো সময়ের জন্য শেষ হয় না।

আমরা যে কথা বললাম, হয়তো সুরা নিসার এই আয়াত নিশ্চিতভাবেই সে কথা প্রমাণ করছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসুলের প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি—যে কিতাব তিনি তাঁর রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যে কিতাব পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং পরকাল দিবসকে অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।'[১৩]

সুতরাং যাদের ইমানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তারা আগে থেকে ইমানদার। যার প্রতি তাদের ইমান আনতে আহ্বান করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা ইতিপূর্বেই সেগুলোর প্রতি ইমান এনেছে। তারপরও তাদের ইমান আনতে বলা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসুলের প্রতি, যে কিতাব তিনি তাঁর রাসুলের প্রতি নাজিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে যে কিতাব নাজিল করেছেন তার প্রতি। আল্লাহ এদের সম্পর্কেই সুরা বাকারার শেষে এভাবে বলেছেন :

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

'রাসুলের প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, তার প্রতি রাসুল ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলদের প্রতি। (তাঁরা বলে) "আমরা রাসুলদের থেকে কারও মাঝে পার্থক্য করি না।"'[১৪]

---

১৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৩৬।

১৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮৫।

তাই মানবজীবনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি সার্বক্ষণিকের বিষয়। তাওহিদের প্রতি শুধু কাফিরদেরকেই আহ্বান করা হয় না, শুধু মুশরিকদের তাদের আকিদা শুদ্ধ করার প্রতি আহ্বান করা হয় না; বরং মুমিনদেরকেও এই তাওহিদের প্রতি আহ্বান করা হয়। এই তাওহিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তাদের হৃদয়ে এই ইমান জাগ্রত থাকে। তাদের অন্তরাত্মায় তা অবিচল থাকে এবং তাদের বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত হয়। যাতে এর প্রতি তারা শিথিলতা না দেখায় এবং এর দাবি থেকে উদাসীন না হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا...

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইমান আনয়ন করো...।'[১৫]

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই যে মূল ও আসল বিষয়, এটা কোনো আশ্চর্যকর ব্যাপার নয়!

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি কুরআনের গুরুত্বারোপের কারণ এই নয় যে, কুরআন একটি ধর্মের গ্রন্থ; বরং একমাত্র কারণ হচ্ছে, কুরআন এমন গ্রন্থ, যা মানুষের জীবনের পথপন্থা নির্ধারণ করে দেয়।[১৬]

কারণ, মানুষের জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ না সে সেই সত্যকে জানবে, যা দ্বারা আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং যতক্ষণ না তার জীবন সেই সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অতঃপর কখনোই তা থেকে বিচ্যুত না হবে এবং তার দাবি থেকে সরে না দাঁড়াবে।

আর সেই সত্য হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া)। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা, তিনিই একমাত্র কর্তৃত্ববান। তিনিই একমাত্র ব্যবস্থাপক। তিনিই একমাত্র সর্বনিয়ন্তা। তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে সৃষ্টি করে বা রিজিক দেয় অথবা সকল কিছু পরিচালনা করে।

এ সবকিছুর দাবি হচ্ছে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না। তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে ইবাদত-উপাসনা অর্পণ করা যাবে না।

তা ছাড়া এটা বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকারও বটে। কারণ, সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, অনুগ্রহকারী এবং দয়াকারীর অধিকার হচ্ছে, তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কারও উদ্দেশ্যে

---

১৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৩৬।

১৬. 'দিরাসাতুন কুরআনিয়্যাহ' বইয়ে এই অর্থটির দিকে ইঙ্গিত করেছি।

উপাসনা করা যাবে না, যে কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি, কারও রিজিকের ব্যবস্থা করেনি, কাউকে অনুগ্রহ করেনি এবং কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করেনি। সেই সাথে এটা স্বয়ং মানুষেরও অধিকার।

সুতরাং যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, অনুগ্রহশীল, দয়ালু—তিনিই নিরঙ্কুশ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। যেহেতু তিনি উপাস্য এবং রব হওয়ার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দা এবং তাদের ইবাদত থেকে অমুখাপেক্ষী। তারা তাঁর ইবাদত করা বা কুফরি করা—এটা তাঁর রাজত্বে কোনো প্রভাবই ফেলে না!

মহান আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলছেন :

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا

'হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও, তবে তা আমার রাজত্বে একটুও বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচেয়ে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও, তবে তা আমার রাজত্বে এতটুকু হ্রাস করবে না।'[১৭]

প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলছেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

'আর মুসা বলল, "যদি তোমরা এবং জমিনের সকলে মিলে কুফরি করো, তবে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত।"'[১৮]

আর মানুষ, তাদের বিষয়টি এর বিপরীত।

---

১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭।

১৮. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৮।

কারণ একদিকে সে তার জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে এক মুহূর্তের জন্য অমুখাপেক্ষী হয় না—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

'হে লোক সকল, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি তোমাদের অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদের আসমান-জমিন থেকে রিজিক দান করে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাহলে তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে!'[১৯]

আবার অপরদিকে সে স্বভাবজাত দাস ও বান্দা। তার জীবনে এমন এক মুহূর্ত অতিক্রম করে না, যে মুহূর্তে সে কারও না কারও দাস ও বান্দা হয় না। সেটা তার উপলব্ধিতে আসুক বা না আসুক।[২০] জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সে এই দুই অবস্থার কোনো একটিতে থাকে—যাতে কোনো তৃতীয় অবস্থা নেই : হয়তো সে এক আল্লাহর বান্দা হবে, যাঁর কোনো শরিক নেই। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর দাস ও বান্দা হবে; সে বস্তু তার সাথে থাকুক বা ভিন্ন হোক—দুটোই বরাবর—যেটাকে আল্লাহ নাম দিয়েছেন 'শয়তানের ইবাদত'। কারণ এটা শয়তানের ডাকে সাড়া দান—

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

'হে আদম-সন্তান, আমি কি তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিইনি, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তোমরা আমার ইবাদত করো। এটা সরল সঠিক পথ।'[২১]

আবার মানুষের গঠনপ্রণালিতে (যে স্বভাবের ওপর আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন) প্রবৃত্তির প্রতি গভীর আগ্রহ আছে। সেটাকে আল্লাহ এভাবে চিত্রিত করছেন :

---

১৯. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৩।

২০. এমনকি যারা নিজের ব্যাপারে বলে, তারা নাস্তিক, তারা কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে না, কারও উপাসনা করে না, তারাও নিজেদের প্রবৃত্তি আর কামনাবাসনার দাস। যেমন আল্লাহ বলেন, (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ) 'আপনি কি তাকে দেখেননি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' - সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৩।

২১. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৬০-৬১।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা—নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত স্বর্ণ, রৌপ্যভান্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী।'[২২]

যদিও এ সকল প্রবৃত্তির চাহিদা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মাঝে সংযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহর কোনো প্রজ্ঞার কারণে।[২৩] কিন্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরানোর জন্য শয়তান এসব ছিদ্রপথেই আস্তে আস্তে মানুষের কাছে প্রবেশ করে, সাময়িক সময়ের জন্য আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। ফলে সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং চোর যখন চুরি করে, তখন মুমিন অবস্থায় চুরি করে না।'[২৪]

অথবা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেখানে আল্লাহ এবং তার মাঝে কোনো সম্পর্ক বাকি থাকে না। হয়তো তাকে শিরকে, কুফরে অথবা নাস্তিকতায় লিপ্ত করায়। ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

'সে (শয়তান) বলল, "তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের জন্য তোমার সরল পথে ওত পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।"'[২৫]

---

২২. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪।

২৩. ইবাদতের মর্ম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

২৪. সহিহুল বুখারি : ৬৭৮২, সহিহ মুসলিম : ৫৭।

২৫. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬-১৭।

আল্লাহর দাস হওয়া এবং শয়তানের দাস হওয়ার মাঝে মানুষের জীবন সমান হতে পারে না।

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎপথে চলে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে।'[২৬]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

'বলুন, "অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি সমান হয়, অথবা আলো ও অন্ধকার কি সমান হয়?"'[২৭]

আল্লাহর একটি অনুগ্রহ হচ্ছে, বান্দা যখন তাদের ওপর থাকা আল্লাহর হক আদায় করে, যখন তারা আল্লাহকে অদ্বিতীয় রব ও উপাস্য বলে স্বীকার করে এবং তাঁর কাছে শিরকমুক্ত খালিস ইবাদত প্রেরণ করে, তখন তারা সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেভাবে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের জীবনটা দুনিয়াতেই উত্তম, নির্মল ও সবচেয়ে সুন্দর জীবন হয়ে যায়। আবার পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদানও থেকে যায়।

পক্ষান্তরে তারা যখন কুফরি করে, তখন তারা দুনিয়ার জীবনে পশুর ন্যায় ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদাকৃত শাস্তিও নির্ধারিত থাকে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

'যারা কুফরি অবলম্বন করেছে, তারা জীবন উপভোগ করে এবং ভক্ষণ করে, যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে। আর জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।'[২৮]

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

'যারা তাগুতের ইবাদত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদের আপনি সুসংবাদ দিন।'[২৯]

---

২৬. সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২২।
২৭. সূরা আর-রাদ, ১৩ : ১৬।
২৮. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১২।
২৯. সূরা আজ-জুমার, ৩৯ : ১৭।

এ কারণে মানুষ সর্বদাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি মুখাপেক্ষী।

মানুষ কাফির হোক বা মুশরিক, তার মূল আকিদা বিশুদ্ধ করার জন্য সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি মুখাপেক্ষী। মুমিন অবস্থায়ও এর প্রতি মুখাপেক্ষী; যাতে সচেতন ও সতর্ক থাকতে পারে এবং শয়তান আসার সকল ছিদ্রপথ সংকীর্ণ করতে পারে। অন্যথায় শয়তান তাকে আল্লাহর ন্যায্য ও অপরিহার্য ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে। কারণ এটা কোনো নিরর্থক 'বাক্য' নয়, যার বাস্তব জীবনে কোনো দাবি ও প্রভাব থাকবে না।

এখন আমাদের দেখতে হবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মাঝে কোন মিশন বাস্তবায়ন করেছে। তার আগে দেখতে হবে, আরবের মুশরিকরা সেটাকে কেন প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেন তার দাওয়াতের সাথে সংঘাতে জড়িয়েছিল। যে তিক্ত সংঘাতের কথা ইতিহাসে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে?

নিশ্চয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আদম ﷺ থেকে নুহ ﷺ অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবি-রাসুলের দাওয়াত। আর এই দাওয়াতের সামনে জাহিলিয়াতের অবস্থান একটিই ছিল। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা হচ্ছে, প্রত্যাখ্যান করা, বাধা সৃষ্টি করা, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং এড়িয়ে চলা।

কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এ মিশনের ক্ষেত্রে জাহিলদের কীসে একই অবস্থান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করত। বিশেষত এ অবস্থান যখন প্রত্যেক জাহিলি যুগের অহংকারী সর্দারদের পক্ষ থেকে হতো?!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ - أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ - فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

'আর আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (সে বলল) "আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করো। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাময় দিবসের আজাবের

ভয় করছি।" তখন তার সম্প্রদায়ের কাফিরপ্রধানরা বলল, "আমরা তোমাকে কেবল আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আর আমরা দেখছি, কেবল নিম্নশ্রেণির স্থূলবুদ্ধির লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে। আমরা আমাদের ওপর তোমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। বরং আমরা তোমাকে মিথ্যুক মনে করছি।"[৩০]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ

'আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা শুধুই মিথ্যা আরোপ করছ।'[৩১]

قَالُوا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

'তারা বলল, "হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের ছাড়তে পারি না। আর আমরা তোমাকে বিশ্বাসও করি না।"[৩২]

সালিহ, শুআইবসহ সকল নবিদের ক্ষেত্রে একই কাহিনি ঘটেছে। আরবের জাহিলিয়াত পূর্বের জাহিলিয়াত থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। আর এটা স্বীকৃত যে, ইতিপূর্বে এ দাওয়াত নিয়ে যত রাসুল প্রেরিত হয়েছিলেন, প্রত্যেকের যুগের জাহিলিয়াতই তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। সুতরাং আরব জাহিলিয়াত কেন এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঠিক সেই দাম্ভিকতাপূর্ণ অবস্থান নিয়েছিল? কেন এ দাওয়াতকে সেই কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল—যেভাবে করেছিল পূর্বের প্রতিটি জাহিলিয়াত?

শুধু কি এ বাক্যের কারণে এমন করেছিল? না এ বাক্যের আহ্বান ও দাবির কারণে এমনটি করেছিল? তাদের অনুভূতিতে সে বাক্যের দাবিই বা কী ছিল? এই বাক্যের দাবি হিসেবে তাদের বর্তমান জীবনাচারের চিত্র আর এই বাক্য যে জীবনাচারের দিকে

৩০. সুরা হুদ, ১১ : ২৫-২৭।
৩১. সুরা হুদ, ১১ : ৫০।
৩২. সুরা হুদ, ১১ : ৫৩।

আহ্বান করেছিল, সে চিত্রের মাঝে পার্থক্যই-বা কী ছিল? নাকি তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাঝে প্রবেশ করলে তাদের পূর্বের জীবনাচারের ব্যাপারে শঙ্কা করত?

কারণ, এটা তো কোনোভাবেই কল্পনা করা যায় না যে, কোনো দাবি ও আহ্বান ছাড়া শুধুই এই বাক্যের কারণে কুরাইশরা এমন দাম্ভিকতাপূর্ণ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। শুধু এই বাক্যের কারণেই এত সব সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। যার কারণে একপর্যায়ে তাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ফসকে গেছে এবং নিহত হতে হয়েছে তাদের বড় বড় বীরদের। একইভাবে আরবের অন্যান্য গোত্রের ব্যাপারেও কল্পনা করা যায় না যে, তারা কেবলই এই বাক্যের কারণে এত ভয়াবহ যুদ্ধে নেমেছিল; যদি না এ বাক্য তাদের জীবনে সামান্য কিছুও পরিবর্তন করত। একটু হলেও তাদের জীবনধারাকে আগপিছ না করত।

আর যেখানে কুরাইশ গোত্রে কোনো কবি জন্ম নিলেই তারা বাকি গোত্রসমূহের ওপর এ নিয়ে গর্ব করত, সেখানে তাদের থেকে কোনো নবির আবির্ভাব হওয়ার পর কী অবস্থা হওয়ার কথা ছিল? যেহেতু কুরাইশের বিশেষ ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল—যা তাকে ওই সময়ে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করেছিল—সেখানে একজন নবির জন্ম সে ধর্মীয় নেতৃত্বকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া এবং এখান থেকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার কথা ছিল।

তাহলে কী কারণে কুরাইশ গোত্র সে বাক্যটি উচ্চারণ করতে অস্বীকার করেছিল, যদি সে বাক্য কেবলই উচ্চারণ করার মতো বাক্য হয়ে থাকে?!

আবার রাসুল ﷺ স্বীয় চাচাকে ইসলাম গ্রহণে পীড়াপীড়ি করে বলছিলেন, 'চাচাজান, কালিমা বলুন, এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করব।' তখন কি আবু তালিবের পক্ষ থেকে কালিমার বাক্য প্রত্যাখ্যান করার কল্পনা করা যায়, যদি বাক্যটি কেবল অন্তঃসারশূন্য বাক্য হয়ে থাকে! অর্থাৎ এ বাক্যের যদি কোনো আবেদন না থাকে এবং এর কারণে কোনো ধরনের পরিবর্তন না আসে? এই সহজ-সরল ও সাদাসিধে কথাকে আমরা বিতর্কের স্থান মনে করি না।

তারা যে জীবনাচার মেনে চলছিল এবং তাওহিদের বাক্য যে জীবনাচারের দিকে আহ্বান করছিল, এ দুটি চিত্রের মাঝে ব্যবধানটা ছিল অনেক বড়। এই দাওয়াতের বিরোধিতায় তাদের পদ্ধতি ও প্রকৃতি কয়েক রকম ছিল :

আগামীর পথে

এ বইতে আমরা ইসলামের কিছু মৌলিক বুঝ ও মর্মকথা নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্ণনা করেছি যে, এ মৌলিক বিষয়াদি সেই শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের চেতনা-উপলব্ধিতে কেমন ছিল, যাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে সরাসরি এ মর্মকথা ও উপলব্ধি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর চোখের সামনে তারবিয়াত পেয়েছিলেন। বর্ণনা করেছি তৎপরবর্তী প্রজন্মগুলোর চেতনা-উপলব্ধিতে এগুলোর প্রতিচ্ছবি কেমন ছিল, যে প্রজন্মগুলো আলোর ঝরনার নিকটবর্তী ছিল। বর্ণনা করেছি এরপর কীভাবে সর্বশেষ প্রজন্মগুলোর চেতনায়-উপলব্ধিতে এ মৌলিক বিষয়াদি সঠিক রূপ থেকে দূরে সরে ভয়ানকরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আর এ পরিবর্তন কীভাবে মুসলিমদের জীবনে প্রভাব ফেলল এবং তাদের নামিয়ে আনল অতীতের সর্বোচ্চ স্থান থেকে একেবারে বর্তমানের সর্বনিম্ন স্থানে; ফলে তারা পানির স্রোতে ভাসা খড়কুটোর মতো নগণ্য হয়ে গেল!

এখন অবশ্য প্রশ্ন আসতে পারে, এ আলোচনা তো বুঝলাম; কিন্তু আমরা এরপর কী করব?!

অবস্থা যখন এতই নাজুক যে, উম্মাহর অধিকাংশ সদস্য চিন্তা ও আমলের দিক থেকে প্রকৃত ইসলাম থেকে এতটা দূরে সরে গেছে, এখন ভবিষ্যতে তাদের কী করতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভার আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির নিজের কাঁধে নিয়েছে, যা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ী 'ইসলামি জাগরণ' অস্তিত্বে এনেছে :

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ তাঁর কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল ও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না।'[৪৩৭]

বর্তমানে চারদিকে ইসলামি জাগরণ আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য নির্ধারিত তাকদির। আল্লাহ একে অস্তিত্বে এনেছেন অধঃপতনে পরিবেষ্টিত খড়কুটো হয়ে যাওয়া উম্মাহকে সঠিক পথের দিকে, আসল ইসলামের দিকে, নতুন করে আপন ভূমিকায় ফিরে আসার দিকে বের করে আনার জন্য। যাতে উম্মাহ নিজেকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার পরিস্থিতি থেকে, বিক্ষিপ্ততা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে নেয়, একই সাথে যেন উম্মাহ আলোকিত আলোকধার হয়ে উঠে পথহারা মানবতার জন্য; যেন উম্মাহ মানবতাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারে।[৪৩৮]

কিন্তু ইসলামি জাগরণের সামনের পথ দুর্গম, জটিলতায় পূর্ণ, কাঁটা-বিছানো, স্খলনের আশঙ্কা ও হিংস্র আক্রমণকারী দ্বারা পূর্ণ। এ আক্রমণকারী হঠাৎ পথিকদের ওপর আক্রমণ করে একে একে সবাইকে শেষ করে দিতে চায়। কারণ তারা জানে, যদি আজকে এদের শেষ না করা হয়, তবে সামনে এরাই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে!

কিন্তু (যেমনটি আমি 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইতে ইঙ্গিত দিয়েছি) সুসংবাদ প্রতিবন্ধকতার চেয়ে বড়। আর আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছাবেই, কোনো কিছুই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না!

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

'যারা কুফরি করে, তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, তারা প্রাধান্য লাভ করে নিয়েছে, তারা মুমিনদের কক্ষনো পরাজিত করতে পারবে না।'[৪৩৯]

কিন্তু এ জাগরণকে বুঝতে হবে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী; যাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায় এবং যাতে এসব প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সে নিতে পারে। যেমনিভাবে তাকে বুঝতে হবে হিংস্র আক্রমণকারীর স্বভাব কেমন হয়ে থাকে, তাকে বুঝতে হবে তাদের সাথে এ যুদ্ধের স্বভাব-প্রকৃতি কেমন, যুদ্ধের ক্ষেত্র ও ময়দানসমূহ সম্পর্কে তাকে জানতে হবে; যাতে এ জাগরণ এমন ভুল ধারণায় না

৪৩৭. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২১।

৪৩৮. 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইয়ের 'আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া ও নাজরাতুন ইলাল মুসতাকবিল' অংশটি পড়তে পারেন।

৪৩৯. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৯।

পড়ে যে, আক্রমণকারীদের একটি অংশ অন্য অংশের চাইতে মুসলিমদের প্রতি বেশি দয়ালু অথবা কোনো একটি অংশ এই পথের পথিকদের সাথে শান্তি স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে!

ইসলামি জাগরণকে সকল কিছুর আগে বুঝতে হবে তার মাঝে ও আল্লাহর শত্রুদের মাঝে চলা এই হিংস্র যুদ্ধে বিজয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে, যে যুদ্ধে অবশ্যই তাকে পড়তেই হবে; চাই সে যুদ্ধ করার প্রতি তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক। কারণ ওই শত্রুরা কখনো ইসলামি জাগরণের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, কখনো ইসলামি জাগরণের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ থামাবে না :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও নাসারারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্ম গ্রহণ করেন।'[৪৪০]

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়।'[৪৪১]

ইসলামি জাগরণের প্রথমে ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত যে, এ যুদ্ধ এ দল বনাম ওই দল নয়, এ যুদ্ধ এ শত্রু বনাম ওই শত্রুর মধ্যে নয়; বরং এ যুদ্ধ পুরো মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধ তাদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে। আল্লাহর শত্রুরা ও ইসলামের মাঝে সর্বদা যুদ্ধ চলতেই থাকবে; চাই শত্রুরা যেভাবেই থাকুক, আর ইসলাম যেভাবেই থাকুক।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামি জাগরণকে বুঝে নিতে হবে যে, যদি শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল এখানে-সেখানে লড়াইরত থাকে, তাহলে বিজয় আসবে না। হিংস্র আক্রমণকারী এ বিচ্ছিন্নতা থেকে সুযোগ নেবে এবং এ বিচ্ছিন্নতা তাকে শক্তি জোগাবে; যদিও মুসলিম উম্মাহ অন্যসব দিক থেকে পরস্পরে ভিন্নতা থাকুক না কেন, তবে যখন যুদ্ধটা ব্যাপকভাবে পুরো মুসলিম উম্মাহর সকলের যুদ্ধ হয়ে যাবে, যখন যুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ একীভূত হয়ে একযোগে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বে, তখন আল্লাহর তাওফিকে বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

৪৪০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১২০।
৪৪১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭।

যখন আমরা বলি, পুরো উম্মাহ, তখন কিছু মানুষ ভেবে বসে আমরা উম্মাহর একেবারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য নিচ্ছি। এমনটা হওয়া অসম্ভব! হাজার মিলিয়ন সংখ্যায় পৌঁছে গেছে এ উম্মাহ। ইতিহাসে কোনো সমাজই এমন ছিল না, যে সমাজের প্রত্যেকের অন্তর এক রকম ছিল, তাদের সকলের মানসিকতা একই রকম ছিল অথবা সকলে একই সমান স্তরে শত্রুর বিরুদ্ধে অনমনীয় ছিল অথবা সকলে একইভাবে কল্যাণের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সমাজও এমন ছিল না। যেমনটা আমরা স্পষ্ট করে অনেক বার বলে এসেছি এবং অনেক বইয়ে বলেছি।

তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরো উম্মাহর মাঝে একটি দৃঢ় ঘাঁটি থাকতে হবে (যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সমাজে একটি দৃঢ় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত ছিল)। এ ঘাঁটির শক্তি ও দৃঢ়তা এতটা উঁচু স্তরে উন্নীত হবে যে, এটি দুর্বল ইমানদার, বাধাদানকারী, মন্থরতাকারী, অলসতাকারী, কপটতাকারীদের দায়িত্ব বহন করে সবাইকে নিয়ে এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। যেমন আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর হাতে গড়া দৃঢ় ঘাঁটি চলেছিল, এসব সমস্যাযুক্ত দলের উপস্থিতি তাঁদের চলার পথে বাধা হতে পারেনি, বাধা হতে পারেনি আল্লাহর শত্রুদের ওপর এ দৃঢ় ঘাঁটির মীমাংসিত বিজয়ের পথে।

আর ইসলামি জাগরণ আন্দোলনের জেনে রাখা উচিত যে, এ যুদ্ধ মানবজাতির অনেকগুলো দল থেকে একটি দলের সাথে আরেকটি দলের যুদ্ধের মতো নয়, অথবা অনেকগুলো জাতি থেকে একটি জাতির সাথে আরেকটি জাতির যুদ্ধের মতো নয়, অথবা বহু ধরনের অস্ত্রের মধ্যে এক ধরনের অস্ত্রের সাথে আরেক ধরনের অস্ত্রের যুদ্ধের মতো নয়। বরং এ যুদ্ধ এসব কিছুর আগে, এসবের চাইতে গুরুতর, এটা বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের যুদ্ধ, জীবনব্যবস্থার সাথে জীবনব্যবস্থার যুদ্ধ।

এক আকিদায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, রয়েছে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। বিপরীতে অন্য আকিদায় আল্লাহর সাথে অনেক ইলাহকে শরিক করা হয়, অথবা অস্বীকার করা হয় আল্লাহর অস্তিত্বকে। একদিকে রয়েছে তাওহিদের আকিদা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা, যার উৎস রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ ওহি। অন্যদিকে রয়েছে শিরক-কুফর ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা, যার উৎস ওহির বিপরীত যেকোনো কিছু।

জাহিলিয়াত তার মৃত দেহ নিয়ে কখনো তাওহিদের আকিদার সামনে এভাবে দাঁড়াতে পারেনি, যেভাবে আজ দাঁড়িয়েছে। তবে পূর্বে আরও একবার এটা দাঁড়িয়েছিল তাওহিদের আকিদার সামনে। সে সময়টা হচ্ছে রাসুল ﷺ-এর আগমনের সময় ও

ইসলামের প্রথম সময়। তবে এখনকার সময়ের জাহিলিয়াতের সাথে আগের সময়ের জাহিলিয়াতের একটি তফাত আছে, বর্তমানের জাহিলিয়াত বৈজ্ঞানিক উন্নতি, প্রযুক্তিগত উন্নতি, বার্তা প্রেরণ মাধ্যম, মিডিয়ার দিক থেকে এগিয়ে আছে। যার ফলে এখনকার জাহিলিয়াত সব দিক থেকে একজোট হয়ে আছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আরও বেশি একতাবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু যুদ্ধ আগেরটাই রয়ে গেছে। যুদ্ধটা এখনো তাওহিদ ও শিরকের মাঝে। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে।

ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাহিলিয়াতের বিভিন্নধর্মী শত্রুর মোকাবিলা করেছে। একবার ক্রুসেডারদের সাথে। আবার তাতারদের সাথে। তারও আগে ইহুদিদের সাথে। তবে পুরো দুনিয়ার একতাবদ্ধ জাহিলিয়াতের সামনে এ পর্যন্ত দুবার পড়তে হয়েছে : এক. রাসুল ﷺ-এর আগমন ও ইসলামের প্রথম যুগের সময়টাতে। দুই. বর্তমান সময়ে।

এই কারণে আবশ্যক হচ্ছে যেমনটা আগে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, প্রত্যেক মুসলিমের আকিদা হতে হবে বিশুদ্ধ, ইমান হতে হবে অন্তরের একেবারে গভীরে প্রোথিত, অন্তর হতে হবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত—যেমনটা তাঁদের অবস্থা ছিল প্রথমবারের একতাবদ্ধ জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় ইসলামি জাগরণকে খেয়াল রাখতে হবে যে, বর্তমানে ইসলামের বিরুদ্ধে যে জাহিলিয়াত দাঁড়িয়ে আছে, সেটা তার বস্তুগত সভ্যতার উন্নতির চূড়ায় রয়েছে আর সে সভ্যতার মাধ্যমে ফিতনা ছড়ানোর সর্বোচ্চ সক্ষমতায় রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মুসলিমরা অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে।

তাই এখানে করণীয় হচ্ছে বর্তমান জাহিলি সভ্যতাকে মুসলিমদের সেভাবে মোকাবিলা করতে হবে, যেভাবে প্রথম যুগের মুসলিমরা পারস্য ও বাইজান্টাইন সভ্যতাকে তাদের সর্বোচ্চ বস্তুগত সামর্থ্য থাকার সময় পরাজিত করেছিল। অর্থাৎ মুসলিমরা নিজেদের সভ্যতাগত আদর্শ দিয়ে জাহিলি সভ্যতার মোকাবিলা করবে।

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের প্রথম মোকাবিলা এমন অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলিমদের কাছে প্রায় কোনো ধরনের বস্তুগত সভ্যতাভিত্তিক সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাপনা ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে এ দুটো পরাশক্তি তখন বস্তুগত সভ্যতা ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এমন সুউচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল, যতটা উঁচুতে এর আগে ইতিহাসে কেউই পৌঁছেনি। কিন্তু সবশেষে বিজয় হয়েছে ইসলামেরই।

ইসলাম আল্লাহর সুন্নাতে জারিয়ার মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছে, কেবলই সুন্নাতে খারিকা (অলৌকিকতা)-র মাধ্যমে নয়; যদিও দুটোই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের মাধ্যমেই ফলে।

আল্লাহর সুন্নাতে জারিয়া হচ্ছে, হকের অনুপস্থিতিতে বাতিল ফুলে ফেঁপে ওঠে। এরপর যখন হক আসে, তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'বলুন, "সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"'[৪৪২]

আল্লাহর সুন্নাতে জারিয়া হচ্ছে, হক বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করার জন্য—

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

'যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহকারী।'[৪৪৩]

আল্লাহর সুন্নাহ হচ্ছে, হকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী একদল সৈনিক থাকবে, কারণ সৈনিক ছাড়া হক বিজয়ী হতে পারে না। এ সৈনিকদল আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে, আকিদার বন্ধনে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকবে, তাদের অন্তর আকিদার ভিত্তিতে গঠিত হবে—

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ - وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'তিনি তো তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা আপনাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তার সবটুকু খরচ করলেও আপনি তাদের অন্তরগুলোকে

৪৪২. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৮১।
৪৪৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৫১।

প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাবান।'[৪৪৪]

আর এ সৈন্যদল সত্যিকারার্থে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী হবে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'হে নবি, আল্লাহই আপনার আর আপনার অনুসারী ইমানদারদের জন্য যথেষ্ট।'[৪৪৫]

এরপর আল্লাহর সুন্নাতে জারিয়া হচ্ছে, হকের অনুপস্থিতিতে বাতিল তার বস্তুগত শক্তির মাধ্যমে স্ফীত হয়; যদিও বাতিলের কোনো দৃঢ়তা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাতিল কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে রাজত্ব করে, আর সেটা হয়ে থাকে আল্লাহর হিকমতের স্বরূপ ও আল্লাহর নির্ধারিত সুন্নাহর বদৌলতে—

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'তাদের যে উপদেশ করা হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য যাবতীয় নিয়ামতের দরজা খুলে দিলাম; পরিশেষে তাদের যা দেওয়া হলো, তাতে তারা যখন আনন্দে মেতে উঠল, হঠাৎ তাদের ধরে বসলাম। তখন (যাবতীয় কল্যাণ থেকে) তারা নিরাশ হয়ে গেল। অতঃপর যারা জুলুম করেছিল, তাদের শিকড় কেটে দেওয়া হলো, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।'[৪৪৬]

যখন হক আসে (আর হকই তো মূল ভিত্তি) এবং তার উপাদানসমূহ পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ হকের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের সেনাদল থাকে, যারা একনিষ্ঠ ইমানের অধিকারী হয়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রত্যাশী ধৈর্যশীল মুজাহিদ, তখন হক তার দৃঢ়তার মাধ্যমে বিজয়ী হয়; যদিও হকের সেনাসংখ্যা ও সরঞ্জাম কম হোক না কেন। কারণ হক সে মৌলিক মূল্যবোধ ধারণ করে, যার পক্ষে আল্লাহ তাআলা স্থায়িত্ব ও কল্যাণ লিখে দিয়েছেন—

---

৪৪৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬২-৬৩।
৪৪৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৪।
৪৪৬. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৪৪-৪৫।